একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Draupadi's Adherence in Bengali Short Stories (Based on Selected Stories)

বাংলা ছোটগল্পে দ্রৌপদী অনুষঙ্গ (নির্বাচিত গল্প অবলম্বনে)

Name of the Author: **Suchitra Karar**

Affiliation: **Research Scholar, Bengali Department, Visva-Bharati, West Bengal, India**

Abstract: Only after the emergence of short stories in literature did the mindset of looking at the 'Ramayana-Mahabharata-Purana' anew arise. As a result, it has been repeatedly seen that mythological women have lost their individuality, behavior and pronunciation, their individuality, their hope and dreams, their hopes and dreams, their hopes and dreams have been crushed in the present or in the hostile environment. Therefore, the position of women in a patriarchal society, the sexual subjugation of women was in the 'Mahabharata' five thousand years ago and is still in the present era. In the present article, we have tried to discuss the various divisions of their new development or reconstruction through the exploration of the selected stories based on the character of Draupadi of the 'Mahabharata'. The indomitable life-oriented, vibrant, invincible Mahabharata womanhood of an era becomes inactive or defeated in the story of a time. In order to embody the problems of the modern era, writers are finally forced to apply the metaphor of 'Mahabharata'.

Keywords: Mahabharata, Draupadi, Ajker Draupadi, Chotogalpa

বাংলা ছোটগল্পে দ্রৌপদী অনুষঙ্গ (নির্বাচিত গল্প অবলম্বনে)

সুচিত্রা কড়ার

‘ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা,
ছোটো ছোটো দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল।’

‘ছোটগল্প’ শব্দটি শুনলেই আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সোনার তরী’র এই উক্তিটি মনে আসে। আবার বিশ-শতকের কথা-সাহিত্যিক ও সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী ‘ছোটোগল্প’এর ‘ছোটো’ শব্দটির অর্থে বৈঠকী ভঙ্গিতে রসিকতার ছলে বলেছেন, “গণিতে ‘ছোটো’শব্দ Relative ও লজিকে Correlative, কিন্তু সাহিত্যে তা positive।”[১] তাই আমরা বলতে পারি ছোটগল্প আসলে নিতান্ত ছোটো নয়। ‘মহাভারত’এ বিধৃত হয়েছে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য তথা ইতিহাস; ভারতবর্ষের অন্তরের চিত্র; তার কলাঙ্গিকের প্রতিচ্ছবি; তার ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, তার সত্য ও সঙ্কল্প , তার সাধনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে ‘মহাভারত’ আসলে ভারতের হৃদয়-জাত, তবে ভারতের অংশমাত্র নয়, বরং ভারতের সঙ্গে অঙ্গীভূত। ‘মহাভারত’-এর প্রধান নারী চরিত্র দ্রৌপদী কালের কঠিন-ভূমিতে অবস্থান করে , প্রতিকূলতা ও বিরোধিতাকে অতিক্রম করে সাধনায় , সংগ্রামে প্রকাশ করতে পেরেছে অমেয় চেতনাকে। আধুনিক লেখক যখন সেই সুদূর বিগত অতীতকে পুনর্বার যাচাই করে নিতে চান তখন সেই সৃষ্টির মধ্যেও আর ও একবার থেকে যায় নানা মাত্রা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর পরাধীনতা আগেও ছিল এবং বর্তমান যুগেও আছে। তাই কুন্তীকে তাঁর কানীন পুত্র কর্ণকে ত্যাগ করতে হয়েছিল , তেমনই দ্রৌপদীকে পঞ্চস্বামী গ্রহণ করতে হয়েছিল। দ্রৌপদীর অর্জুনের প্রতি অনুভূতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পঞ্চপাণ্ডবের শয্যাসঙ্গিনী করা হয়েছিল । আবার সভাপর্ব দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রেখেছিলেন। বিবাহের পূর্বে পিতার অধীনে বিবাহ পরবর্তীতে স্বামীর অধীনে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীদের বেঁধে রাখে। নারীর অনুভূতি থেকে শুরু করে তার চিন্তা-ভাবনা-যৌনতা সবই সম্পর্ণরূপে পুরুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

১

বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ছোটগল্পকার রূপে আবির্ভাব ঘটে ১৯২৮এ। যজ্ঞাগ্নিসম্ভূতা দ্রৌপদী ‘মহাভারত’-এর নারী চরিত্রদের মধ্যে প্রধান। তাঁর মধ্যে অসামান্য রূপ , বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও ক্ষাত্রতেজের সমাহার দেখতে পাওয়া যায়। গজেন্দ্রকুমার মিত্র মহাপ্রস্থানে র মৃত্যুপথযাত্রী দ্রৌপদীর অন্তরের অকথিত অনুভূতিকে উন্মোচন করেছেন ‘যাজ্ঞসেনী’ গল্পে। মহাভারতকার দেখিয়েছেন ঘটনাচক্রে পঞ্চপাণ্ডবকে পতিত্বে বরণ করে নিলেও অর্জুনই ছিল তাঁর কামনার পুরুষ। মহাপ্রস্থানের পথে দ্রৌপদীর প্রথম পতনের কারণ যুধিষ্ঠির অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর অতিরিক্ত প্রণয়কে দায়ী করেছেন । যুধিষ্ঠির বললেন, “ওর পঞ্চ পতির মধ্যে গাণ্ডীবীই বেশি প্রিয় ছিল ওঁর কাছে, বেশী শ্রদ্ধেয়। ”[২] এখন তারই ফল পেয়েছেন। এরপর যুধিষ্ঠির একমনে চললেন, দ্রৌপদীর দিকে আর দেখলেন না। এখান থেকে গল্পে ‘মহাভারত’এর মহাপ্রস্থানিক পর্বে র সঙ্গে কোনো মিল নেই। মৃত্যুপথযাত্রী দ্রৌপদীর অন্তরের অকথিত অনুভূতিকে উন্মোচন করেছেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র।

এখানেই প্রথম দ্রৌপদী পাথরশিলার ওপর শুয়ে শান্তি অনুভব করেছেন , আরাম অনুভব করেছেন , যা সে আগে অনুভব করেননি। কারণ দ্রৌপদী বিবাহিত জীবনে কখনো শান্তি অনুভব করেননি। স্বয়ম্বর সভায় বিজিত হওয়ার পর থেকেই অবিরাম তাঁকে নানা সমস্যা , দুশ্চিন্তা, লাঞ্ছনা, ও দুর্বিসহ দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে , করতে হয়েছে সপ্তপ্রহর কঠোর পরিশ্রম। গল্পকার দ্রৌপদীর বিবাহিত জীবন সম্পর্কে বলেছেন, সাধারণ মেয়েদের একটি স্বামীকে সুখী রাখতেই প্রাণান্ত হতে হয়, তাঁকে পাঁচটি স্বামীকে তৃপ্ত করতে হয়েছে। এই প্রথম তাঁর একটু অবসর মিলল নিজের দিকে তাকিয়ে দেখার। দ্রৌপদীর নিজেকে নিয়ে ভাবার সময় বেশীক্ষণের নয় তাও জান তেন। তবুও তাঁর ভালো লাগছে, মনে হচ্ছে জীবন থেকে তিনি তাঁর কিছু পরমায়ুর ক্ষণ চুরি করে নিতে পেরেছে ন নিভৃতে সম্ভোগ করার জন্য। এই সময় তাঁর পঞ্চস্বামী সম্পর্কেও তিনি ভেবেছেন। তাঁদের চারিত্রিক দোষ , যে দোষের কারণে দ্রৌপদী তাঁদের স্বামী হিসেবে মানতে পারেননি। যুধিষ্ঠির একথা জান তেন যে, দ্রৌপদী একমাত্র অর্জুনকেই ভালোবেসে ছেন। দৌপদী প্রথমে যুধিষ্ঠির সম্পর্কে বলেছেন, "যে মানুষ নারীমাত্রেরই কাম্য—স্বামী হিসেবে ভাবতে গেলে যে মানুষ যে পুরুষ তারা কামনা করে কল্পনা করে যুধিষ্ঠির সে পুরুষ বা সে মানুষ নন। এক এক সময় বরং ক্লীব বলেই মনে হ 'ত ওঁকে।"[৩] তাঁকে 'ক্লীব' মনে হওয়ার কারণও দ্রৌপদী সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। যুধিষ্ঠির সকল দুর্বলতার ঊর্ধ্বে ছিলেন না। তাঁর মধ্যে দয়া-মায়া, ক্ষমা-প্রতিহিংসা, ক্রোধ কিছু ছিল না। কেবল নির্ভুল হিসাব আর জ্ঞান। আত্মরক্ষার জন্য তিনি ভেবেচিন্তে কৌশল অবলম্বন করে নিরপরাধ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটান। 'মহাভারত'এর আদিপর্বে দুর্যোধনের পাণ্ডবদের গৃহে অগ্নিসংযোগের পরিকল্পনা যুধিষ্ঠির বিদূরের কাছ থেকে জানার পর ও পরিবার নিয়ে স্থান ত্যাগ করেননি, তিনি তা করতে পারতেন। নিজেদেরকে কৌরবদের কাছে মৃত প্রমাণ করবার জন্য পরিকল্পনা করে এক নিষাদ-স্ত্রী ও তাঁর পাঁচ পুত্রকে গৃহমধ্যে রেখে ভীম জতুগৃহের দ্বার এবং চতুর্দিকে আগুন লাগিয়েদে ন। যুধিষ্ঠিরের এই কাজ দ্রৌপদী ভালো চোখে দেখেননি। আবার, যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় যথেষ্ট অপটু তাও জুয়াখেলার উত্তেজনায় ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান হারিয়ে স্ত্রী -কে পণ রাখা উচিত কিনা বিচার করেন নি। ভীমকেও দ্রৌপদী ঠিক মনেপ্রাণে প্রিয়তম স্বামী মনতে পারেন নি ; কারণ ভীমের বিশাল দেহ , অপরিমেয় দেহবল , খাদ্যলোলুপতা, প্রেম ও ক্রোধের কারণে দ্রৌপদীর তাঁকে একটা দানব বলেই মনে হতো ; কখনো বা শিশু। এমনকি দ্রৌপদী সহদেব ও নকুলকেও স্বামী হিসেবে মানতে পারেন নি। নকুল সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতা সঙ্গে যে স্নেহ যে মমতা উদ্বেগ থাকে, তা নকুল, সহদেব স ম্বন্ধে ছিল। আর অর্জুন সম্পর্কে তাঁর মত, "ধনঞ্জয়ই স্বামীদের মধ্যে তাঁর প্রিয়তম ছিলেন - তা তিনি অকপটেই স্বীকার করছেন। আর তার জন্য তিনি লজ্জিত কি অনুতপ্ত নন কিছুমাত্র।"[৪] অর্জুন নকুলের মতো রূপবান ছিলেন না শ্যামবর্ণ ছিলেন , অবিরত যুদ্ধের ফলে তাঁর বাহু কীণাঙ্কিত, হাত-পা কঠিন, দেহে অগণিত অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন তবু শীর্ষে-বীর্যে-দুঃসাহসে, পৌরুষে-প্রেমে, আবেগে-রসবোধে, সম্ভোগশক্তিতে জীবনের সর্বক্ষত্রেই অর্জুন অতুলনীয়। এক শরীরে বহু পুরুষের বীর্য ধারণ করেন দৌপদী, বহু পুরুষের সংমিশ্রণ ঘটেছে তাঁর মধ্যে । এখান থেকে দ্রৌপদীর মনে কর্ণের অনুভূতি লেখকের নিজস্ব সংযোজন। 'মহাভারত'-এ দ্রৌপদীর কর্ণের প্রতি কোনো অনুভূতি বা দুর্বলতা ছিল না। গল্পকার লিখেছেন, অর্জুন ছাড়াও কর্ণের কথা দৌপদী মনে রেখেছেন। উদারতায়, মহত্ত্বে, ত্যাগে , দানে,

কৃতজ্ঞতায়, বীর্যে-ক্রুরতায় নীচতায় বর্বরতায় পরিপূর্ণ মানুষ। মাটির মানুষ, তবু সাধারণ মানুষের ঊর্ধ্বে। তাই কর্ণকে ভক্তি না করেও তাঁর দিকে আকৃষ্ট হওয়া যায়। দ্রৌপদীও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি দুর্বলতা অনুভব করেছিলেন। তিনি আক্ষেপ করেন কর্ণের প্রতি স্বয়ম্বর সভায় নির্দয়তা র জন্য – "কর্ণ ধনুর্বাণের দিকে অগ্রসর হ 'তেই বলে উঠেছিলেন পণে বিজিতা হ 'লেও আমি সূতপুত্রকে বরণ করবনা। সে ক্ষেত্রে বরং আত্মহত্যা করব।"[৫] দ্রৌপদীর জীবনের একটা ভুল হল কর্ণকে অপমান করা, যা 'মহাভারত'-এও দেখা যায়। পাণ্ডবদের নিয়ে সুখী ছিলেন দ্রৌপদী। অনেকদিন তাঁর কথা ভুলেও ছিলেন কিন্তু রাজসূয় যজ্ঞসভায় তিনি আবার কর্ণকে দেখলেন । সে পুরুষ একাগ্রদৃষ্টিতে দ্রৌপদীর দিকে তাকিয়েছিল। কর্ণের সেই দৃষ্টি ছিল প্রেমের দৃষ্টি। যে দৃষ্টি কোনো নারীই চিনতে ভুল করে না; দ্রৌপদীও করেননি। এরপর থেকে কর্ণকে দৌপদী ভোলার চেষ্টা আর করেন নি। বরং তাঁর প্রসঙ্গে শুনতে চাইতেন , তা শ্রবণে দ্রৌপদীর মনে একটা প্রচ্ছন্ন তৃপ্তি হতো। সভাপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের অনুকূলে স্বামীদের সঙ্গে দাসত্ব মুক্ত হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় কর্ণ পঞ্চপাণ্ডবের উদ্দেশে বলে উঠেন, "দ্রৌপদী আজ এক নতুন কীর্তি স্থাপিত করলেন। স্ত্রীকে নৌকা ক 'রে তাঁর বীরস্বামীরা এই বিপদসমুদ্র পার হলেন।"[৬] এই কথায় দ্রৌপদী কর্ণকে ভুল বুঝলেও , কর্ণ এই কথা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের জন্য করেন নি, তিনি দ্রৌপদীর অপমানে বিচলিত হয়েছিলেন। যা দ্রৌপদী পরে বুঝেছিলেন। তাই দ্রৌপদী কোনো ধার্মিক বিচক্ষণ সুধীর পঞ্চপাণ্ডবের মতো স্বামী চাননি। যাঁরা ধর্মের কাছে নতিস্বীকার করে ন্যায়-অন্যায় বোধ হারা ন। তিনি চেয়েছিলেন মানুষকে। যে মানুষ আবেগে দোলে , ক্রোধে উন্মত্ত হয় , প্রতিহিংসায় দুর্দম্য হয়ে ওঠে। পাপ -পূণ্যে, সত-অসতে, ত্যাগে-লোভে মেশানো সম্পূর্ণ মানুষকে। দ্রৌপদীর কর্ণের প্রতি এই অনুভূতি 'মহাভারত' কাহিনির প্রভাবে নয়। বরং গল্পকার গজেন্দ্র কুমার মিত্র দ্রৌপদীর প্রেমভাবনাকে নতুন অনুভূতি দিয়ে গল্পে দ্রৌপদী চরিত্র রচনা করেছিলেন। দ্রৌপদীর না পাওয়াকে , আক্ষেপকে, ন্যায়-অন্যায়-অবিচারকে তিনি 'যাজ্ঞসেনী' গল্পে তুলে ধরেছেন। যেখানে দ্রৌপদী কর্ণের উপর করা তাঁর অবিচারের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী এমনকি কর্ণের প্রেমপ্রার্থীও।

২

মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' (১৯৭৮) গল্পটি কেবল একটি সমকালীন রাজনৈতিক আখ্যান নয় , বরং প্রাচীন মহাকাব্যের বিনির্মাণের মাধ্যমে আধুনিক ভারতের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের এক নগ্ন দলিল। এই গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দোপ্ দি মেঝেন, যে মহাভারতের যজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর এক আধুনিক , আদিবাসী এবং বৈপ্লবিক সংস্করণ। 'মহাভারত'এ দ্রৌপদী রাজকীয় আভিজাত্য , দিব্য সুরক্ষা এবং আর্য সংস্কৃতির প্রতিনিধি, কিন্তু দোপ্দি মেঝেন সেখানে চরম অবহেলিত সাঁওতাল নারী, যিনি রাষ্ট্রীয় সহিংসতা এবং পুরুষতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে নিজের শরীরকেই এক অজেয় মারণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ছেন। নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে গল্পটির কাহিনি বিস্তৃত হয়েছে এবং একই সঙ্গে আদিবাসীদের জীবনের নানা বঞ্চনা ও সংস্কার এবং গৌরব প্রান্ত কাহিনি-সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। নারীর চিরন্তন দুর্বলতা নগ্নতাকে শক্তি হিসেবে , বিদ্রোহ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এ গল্পে। মহাশ্বেতা দেবীর দোপ্দি মেঝেন সাতাশ বছরের এক সাঁওতাল নারী, যাঁর নামটি পর্যন্ত তাঁর নিজের সংস্কৃতির অংশ নয়। গল্পের শুরুতে দেখা যায় , তাঁর নাম দেন শোষক

জমিদার সূর্য সাহুর স্ত্রী , তখন দোপ্‌দির মা তাঁ দের খামারে ধান ঝাড়তেন। এই নাম প্রদানের প্রক্রিয়াটির মধ্যেই শোষক ও শোষিতের এক নিবিড় রাজনৈতিক সমীকরণ ফুটে ওঠে। 'দ্রৌপদী' নামটি যখন আদিবাসী উচ্চারণে 'দোপ্‌দি' হয়ে যায় , তখন তা কেবল ভাষাগত বিকৃতি নয় , বরং তা একটি উচ্চবর্গীয় সাংস্কৃতিক চিহ্নকে নিম্নবর্গের মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর এক প্রচেষ্টাকে নির্দেশ করে। দোপ্‌ দি মেঝেন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি , যিনি জল, জমি এবং জঙ্গল রক্ষার জন্য নকশাল আন্দোলনে যোগ দিতে বাধ্য হন।

নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া অঞ্চল থেকে নকশাল আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। চারু মজুমদার , কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতালের নেতৃত্বে যারা সেদিন গেরিলা পদ্ধতিতে লড়াই করেছিল তাঁদের অধিকাংশই আদিবাসী ভূমিহীন চাষী। আদিবাসী নিম্নবর্গের এই সর্বহারা মানুষগুলো একত্রিত হয়ে উদাসীন সরকার ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধেলড়াইয়ের সংকল্প নেয়। আমাদের আলোচ্য গল্পের দৌপ্‌দি মেঝেন ও দুল্‌ না মাঝি ছিল সেই আন্দোলনেরই অংশ। যাঁরা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন । যথা ধনী জমিদার এবং দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের দ্বারা পদ্ধতিগত-শোষন এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে।বিপদ যত আসন্ন হয়েছে বিদ্রোহের স্বর ততই বজ্রগর্ভ হয়েছে। সরকারি বাবুদের অহংকারকে দৌপ্‌দি ও দুল্‌না প্রতিরোধ করেন। একে একে উচ্চবর্ণের ইঁদারা , টিউবোয়েল দখল, সূর্য সাহুর হত্যা , থানা আক্রমন, বন্দুক অপহরণ ইত্যাদি নানা কর্মের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রেকে বুড়ো আঙুলদেখিয়ে উগ্রপন্থায় সরাসরি সরকারের সঙ্গে শত্রুতায় সামিল হ ন। রাষ্ট্রের খাতায় নাম ওঠে মোস্ট ওয়ান্টে ডের তালিকায়। ঝাড়খা নী জঙ্গলের সাঁওতালদের সঙ্গে উপী মেঝেন ও মাতং মাঝি নামে জীবন শুরু করেন। 'মহাভারত'এর অনুদ্যূত পর্বতে দেখি সভাপর্বের দ্যূতক্রীড়ার পর পরাজিত পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী বনবাসে চলে গেলেন। দ্বাদশ বৎসর বনবাসের পরে একবৎসর পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী মৎস্যদেশে রাজা বিরাটের রাজমহলে ছদ্মবেশে অজ্ঞাতবাস কাটান। ' দ্রৌপদী' গল্পেও পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে দোপ্‌দি ও দুল্‌না ছদ্মবেশে ঝাড়খানী জঙ্গলের সাঁওতালদের সঙ্গে থাকে ন। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকালে কৌরবরা যেমন খুঁজে পায়না, তেমনি পুলিশও দোপ্‌দিদুল্‌নাকে খুঁজে পায় না। এবং পুলিশ দোপ্‌দিকে খোঁজার জন্য একশত টাকা পুরস্কার রাখে।

মহাশ্বেতা দেবীর 'দৌপদী' গল্পের সেনানায়ক চরিত্রটি অত্যন্ত জটিল ; তিনি কেবল সামরিক অফিসার নন, বরং একজন 'বহুত্ববাদী নন্দনতাত্ত্বিক' এবং তত্ত্ববিদ , যিনি তাঁর শত্রুকে ধ্বংস করার আগে তাঁদের মনস্তত্ত্ব পাঠ করেন। দো্ পদির ওপর যে যৌন হিং স্রতা চালানো হয় , তা কেবল ব্যক্তিগত লালসা থেকে নয় , বরং তা ছিল একটি পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় কৌশল—যাকে গল্পের ভাষায় বলা হয়েছে 'মেক হার' বা 'ডু দ্য নিডফুল'। 'মহাভারত'এর বস্ত্রহরণ পর্বটি ভারতীয় সাহিত্যের এক অত্যন্ত প্রভাবশালী দৃশ্য। দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করার চেষ্টা করেন , তখন দ্রৌপদী প্রথমদিকে নিজের শক্তিতে এবং যুক্তি দিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি দেখলেন যে মানবীয় শক্তি তাঁকে রক্ষা করতে ব্যর্থ , তখন দৌপদী শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। অলৌকিক হস্তক্ষেপে তাঁর পরিধেয় বস্ত্র অন্তহীন হয়ে ওঠে এবং তাঁর লজ্জা রক্ষিত হয়। এই অলৌকিকতা দ্রৌপদীকে এক দেবীয় উচ্চতা প্রদান করলেও , এটি পরোক্ষভাবে নারীর অসহায়ত্ব কে

প্রকট করে তোলে। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর গল্পে এই বস্ত্রহরণের ধারণাকে সম্পূর্ণ উল্টে দিয়েছেন। দোপ্ দি মেঝেনকে পুলিশি হেফাজতে বন্দি করা হয় , তখন তাঁর ওপর কোনো অলৌকিক আশীর্বাদ নেমে আসে না। তিনি এক ভয়াবহ গণধর্ষণের শিকার হন , যা সারারাত ধরে চলে। তাঁর শরীর ক্ষতবিক্ষত হয় , স্তন ও যোনি রক্তাক্ত হয়। এখানে কোনো শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্র জোগান দিতে আসেন না। দোপ্ দি চেতনা ফিরে পেয়ে দেখেন যে তাঁকে সেনানায়কের সামনে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাপড় পরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে , তখন তিনি কাপড় ছুঁড়ে ফেলে দেন। দোপ্দি মেঝেন তীক্ষ্ণগলায় সেনানায়ককে বলেন— "কাপড় কী হবে, কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু?"[৭] পুরুষত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তার সামনে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখেন এযুগের দ্রৌপদীরা। ভয়ে সংকুচিত হয়ে ইজ্জত রক্ষায় ত্রস্ত হয় না। বরং সমাজের পুরুষতান্ত্রিক চোখরাঙানিকে বেআব্রু করার সাহস রাখে, যেমনটা করেছেন দোপ্দি। ধর্ষণকামী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও পুরুষদের ধিক্কার জানিয়ে বলেন, "হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কি করবি? লেঃ কাঁউটার কর—"[৮] এরপর দুই রক্তাক্ত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকেন এবং এই প্রথমবার সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।

দোপ্দির এই উলঙ্গতা কোনো পরাজয় নয় , বরং এটি চরম বিদ্রোহ। তিনি 'মহাভারত'-এর দ্রৌপদীর মতো নিজের লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করেন না , বরং নিজের এই রক্তাক্ত , ধর্ষিত শরীরকেই এক বীভৎস সত্য হিসেবে সেনানায়কের সামনে তুলে ধরেন। তাঁর উলঙ্গ প্রতিবাদ সেনানায়ককে হতভম্ব করে দেয়। যিনি ক্ষমতার উচ্চাসনে বসে দোপ্দিকে একটি 'অবজেক্ট' হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন, তিনি হঠাৎ এক 'টেরিফায়িং সুপার অবজেক্ট'-এর সামনে দাঁড়াতে ভয় পান। এই লালসার শিকার শুধু পুরাণের দ্রৌপদীরাই হয় না , আজকের যুগের দোপ্দিরাও হয়। পুরাণের ব্যবহারে মহাশ্বেতা দেবীর সাবলীলতা আমাদের সবসময় বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। তিনি পুরাণকে নবযুগের আলোকে তাৎপর্যময় করে তুলেছেন তাঁর লেখনীতে। এই গল্পে র পুরুষেরা গল্পের দ্রৌপ্ দিকে নগ্ন করতে সফল হয়েছে। এ গল্পের নায়িকাকে লেখিকা তৈরি করেছেন অগ্নিকন্যারূপে; যাঁর জন্মকালের অগ্নিগর্ভে ঘটেছে। তাই তিনি দেহের নিরাভরণ ও বস্ত্রহীনতার লজ্জাকে জয় করে মরণের বেদীতেও সাফল্যের হাসি হেসেছেন। রক্তাক্ত নিরস্ত্র দোপ্দি মেঝেন চোখের সামনে তেজস্বী নারী দ্রৌপদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। যাঁকে স্পর্শ করতে ভয় পায় সেনানায়কের রূপে উপস্থিত ধর্ষ ণকামী পুরুষ। নারী যখন তার সর্বশক্তি দিয়ে স্বমহিমায় অবতীর্ণ হয়ে সংহার মূর্তি ধারণ করে তখন সে অপ্রতিরোধ্য , মৃত্যু তার কাছে উপেক্ষিত। এই কথার মধ্যে দিয়ে 'মহাভারতে'র সভাপর্বে দ্রৌপদীর পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতি ধিক্কার ও প্রতিবাদকে আরও গভীর করে তুলেছে মহাশ্বেতা দেবীর দ্রৌপ্ দি মেঝেন। মহাশ্বেতা দেবী এভাবেই 'দ্রৌপদী' গল্পের নামকরণ ও নায়িকার নামকরণের মধ্যে দিয়ে পৌরাণিক দ্রৌপদী চরিত্রটির বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা দিয়েছেন এযুগের সংকটকালে। যা গল্প ও তার প্লটকে আরও জীবন্ত ও বাস্তবধর্মী করে তুলেছে। যুগের সঙ্গে রূপ বদলেছে কিন্তু নারীশক্তির দর্প এতটুকু কমেনি। আলোচ্য 'দ্রৌপদী' গল্পে মহাশ্বেতা দেবী সেই নারীশক্তির বোধন করলেন সঠিক সময়ের পরিসরে নব অবয়বে।

'মহাভারত'-এর দ্রৌপদী এবং মহাশ্বেতা দেবীর দোপ্ দি মেঝেন—উভয়ই তাঁদের নিজ নিজ সময়ের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের শিকার। কিন্তু তাঁদের মধ্যকার তুলনাটি কেবল যন্ত্রণার সমান্তরাল রেখা নয় , বরং এটি প্রতিরোধের এক ঊর্ধ্বমুখী বিবর্তনকে নির্দেশ করে। 'মহাভারত'এর দ্রৌপদী যেখানে দিব্য সহায়তা এবং পুরুষতান্ত্রিক আইনি যুক্তির ওপর নির্ভরশীল ছিলেন , দোপ্দি মেঝেন সেখানে সম্পূর্ণ একা এবং স্বনির্ভর। দোপ্দি প্রমাণ করেছেন যে , যখন রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক সমস্ত সুরক্ষা কবচ ছিনিয়ে নেওয়া হয় , তখন একজন নারীর শরীরই হতে পারে তাঁর শেষ ও শক্তিশালী কুরুক্ষেত্র। মহাশ্বেতা দেবী প্রাচীন মিথকে ভেঙে আধুনিক ভারতের প্রান্তিক মানুষের এক নতুন পুরাণ তৈরি করেছেন। দোপ্ দি মেঝেন এখানে কেবল একজন আদিবাসী বিপ্লবী নন, তিনি সতীত্ব, লজ্জা এবং নারীত্বের সেই চিরাচরিত সংজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করার এক নতুন আইকন। তিনি 'মহাভারত'-এর দ্রৌপদীর আর্তিকেও ছাপিয়ে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেন—যেখানে নারী আর কারো করুণা প্রার্থনা করে না, বরং নিজের নগ্নতা এবং রক্তাক্ত অস্তিত্ব দিয়েই অত্যাচারীর চোখের সামনে আয়না ধরে তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে।

৩

মহাকাব্য 'মহাভারত'এর দ্রৌপদী চরিত্রটি আজও বাঙালির জীবনে গভীরভাবে প্রোথিত। লেখক ও পাঠক উভয়শ্রেণির মানুষই দ্রৌপদীর চরিত্রের বিশ্লেষণ করে গল্প , উপন্যাস, নাটক লিখে আসছে। পুরাণকে বর্তমান জীবনের চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে গড়ে তোলা খুবই কঠিন। যা হরিশংকর জলদাস তাঁর 'আজকের দ্রৌপদী' গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'মহাভারত'এর দ্রৌপদীর কর্ণকে অপমান করা এবং পরবর্তীতে একসময় তাঁকে পাবার যে একটা অদম্য বাসনা তাঁর মনে জেগেছিল সেই ইতিবৃত্ত এই গল্পের বিষয় । তেমনই একটি গল্পে বর্তমান সময়েও সমান্তরালে চলেছে, পুরাণ আর বর্তমানকে এক ঝোলায় বেঁধে। মনের বহুরূপ আকাঙ্ক্ষা আর দ্বন্দ্বেরই রূপায়ণ এই গল্প।

'আজকের দ্রৌপদী' গল্পে দুটি পরিবার সেনবাড়ি আর ধরবাড়ি। একসময় এই দুই পরিবারের মধ্যে সেনবাড়ির কর্তা প্রতুল সেন ও ধরবাড়ির কর্তা চন্দ্রবিকাশ ধ রের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল কিন্তু এখন দুই বাড়ির মাঝখানে কংক্রিটের দেয়াল। এই দুই পরিবারের বন্ধুত্ব ভাঙে কারণ প্রতুল সেন চন্দ্রবিকাশের ছেলে প্রভাসের বিয়ে ভেঙে দেয় অহনার স ঙ্গে মিথ্যে অভিযোগের দ্বারা। এরপর নিজের ছেলে কল্যাণের স ঙ্গে অহনার বিয়ে দেন। এই ঘটনা খুবই সাধারণ কিন্তু এরপরেই গল্পকার 'মহাভারত'এর প্রসঙ্গ এনেছেন গল্পে। অহনা সংসার করে কল্যাণের সঙ্গে, তাঁদের সুখের সংসার। তারপরও অহনার ভেতরটা জ্বলে। এক অজানা বেদনা তাঁকে কুরে কুরে খায়। দোতলা থেকে অহনা ধরবাড়ির সবকিছু দেখে বিশেষ করে প্র ভাসকে, প্রভাস মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরোয় মাথা তোলে না উপরে। তুললে দেখতে পেত অহনা অপরিসীম তৃষ্ণা নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। এরপরে লেখক 'মহাভারত'-এর স্বয়ম্বর সভার বর্ণনা করেছেন। পাঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদীর জন্য সেই স্বয়ম্বর সভার আয়োজন। সভাতে ব্রাহ্মণবেশে পঞ্চপা ণ্ডব, ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র ও কর্ণ উপস্থিত ছিল। সভার মধ্যে একটি আকাশ মন্ত্র ও একটি প্রায় দুর্জয় ধনু ক রাখা ছিল। ঘোষণা করা হ য়, যিনি এই ধনু কে জ্যা-যোজনা করে আকাশ মন্ত্রের মধ্যে দিয়ে লক্ষ্যবস্তু বিদ্ধ করতে পারবে ন তাঁকে স্বামী হিসেবে বরণ করবে ন

দ্রৌপদী। এখানে দ্রৌপদীর পিতা ও ভ্রাতা ঘোষণা করেননি বংশমর্যাদার কথা। সূতপুত্র কর্ণ ধনু কে তির যোজনা করলে দ্রৌপদী তাঁর উদ্দেশে স ভা মধ্যে বলে ওঠেন, কর্ণ বলবীর্যশালী পুরুষ হলেও উচ্চবংশে জন্ম নয় তাঁর। সুতরাং কর্ণ ক্ষত্রিয় কন্যার বিবাহযোগ্য পাত্র ন ন। কর্ণ সক্ষম হলেও আমি তাঁকে বিয়ে করব না । এই কথায় কর্ণ অপমানিত ও ক্রোধান্বিত হয়ে স ভাস্থল ত্যাগ ক রেন। এরপর অর্জুনের লক্ষ্যভেদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে বিবাহ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, এরপর লেখক জলদাস দ্রৌপদীর মধ্যে কর্ণের জন্য অনুভূতি প্রয়োগ করলেন। যে অনুভূতি 'মহাভারত'-এ কর্ণের জন্য দ্রৌপদীর মনে কখনো উঁকি দেয়নি। জলদাস দ্রৌপদীর মনে কর্ণের জন্য একটা দুর্বলতার অনুভূতির ছবি এঁকে যুদ্ধক্ষেত্রের যুদ্ধকথা পাণ্ডব শিবিরে পৌঁছে যায়। সেখানে কর্ণের শৌর্যবীযের কথা হয় । তা শুনে দ্রৌপদী উল্লাস বোধ করে ন। দ্রৌপদী একা বসে ভাবেন এই কর্ণ একদা তাঁর হবার কথা ছিলেন। কর্ণ একজন মহাবীর তা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি বারবার প্রমাণ করেছেন, দ্রৌপদী স্বয়ম্বর সভায় দেখা দীপ্তময় দীর্ঘদেহে উন্নত নাসিকা ও উজ্জ্বল নেত্রের সেই পুরুষকে কখনো ভুলতে পারেননি। তাই তিনি ভেবেছেন যদি কর্ণকে হৃদয়ের কাছে পাওয়া যেত পরম তৃপ্তি পাওয়া যেত। অহনারও ঠিক একই ভাবে প্র ভাসকে চাই। কল্যাণের সঙ্গে ঘর করে ন অহনা, কল্যাণ তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসে। তাঁর ভালোবাসায় কো নো খামতি নেই তবুও সে প্রভাসকে ভুলতে পারেন না, প্রভাস তাঁর প্রথম দেখা, প্রথম হাত ধরা পুরুষ , সেই বিকেলে এক পর্যায়ে হাতটা ধরে ছিলেন প্র ভাস সেই স্পর্শ এখনো ভোলেননি অহনা। সেই স্পর্শ এত দিন পরেও অহনার হাতে লেগে আছে মাঝে মাঝে হাত বোলান সেই স্পর্শ-অংশে।

কল্যাণের স্নিগ্ধ কোমল আচরণে মুগ্ধ হয়ে ছিলেন অহনা, যখন প্রভাস তাকে বলে ছিলেন খুব ধনী নই আমরা তবে তুমি অসুখে থাকবে না তোমাকে আজীবন ভালোবেসে যাবো আমি। আজও তাঁর মনের এক সুপ্ত বাসনা প্রভাস যদি তাঁর হতো কতই না ভালো হতো। 'মহাভারত'-এ যেমন দ্রৌপদী 'কে অপমান করেছিল তেমনই অহনা ও প্র ভাসের সঙ্গে বিয়ে ভেঙে যাওয়ার সময় নিজের পরিবারকে জোর গলায় বলতে পারেন নি তিনি প্রভাসকে বিয়ে করতে চা ন। কিন্তু কল্যাণের স ঙ্গে তাঁর বিয়ে দেয় তাঁর বাবা। এরপর জলদাস মহাভারতের পা ণ্ডবদের মহাপ্র স্থানের কাহিনিকে বিনির্মাণ করেন। মহাপ্রস্থানের পথে দ্রৌপদীর অকালমৃত্যুর কারণ হিসেবে যুধিষ্ঠির ভীমকে জানা ন অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর পক্ষপাতিত্ব ছিল , এবং কর্ণের প্রতিও মনে মনে প্রচণ্ড দুর্বলতা পোষণ করতেন দ্রৌপদী। এই অপরাধেই দ্রৌপদীর অকালমৃত্যু হল। এরপর লেখক গল্পের অহনার কথা বলেছেন অহনা আসন্ন প্রসবা অবস্থা ক্রিটিক্যাল , মাঝেমধ্যে জ্ঞান হারাচ্ছে ন কল্যাণকে এই অবস্থায় তিনি একটা অনুরোধ করেন। আমি মরার আগে প্রভাসকে এক নজর দেখতে চাই।

পুরাণে দ্রৌপদী কর্ণের প্রতি তাঁর অনুভূতিকে সকলের থেকে লুকিয়ে গেছে ন কিন্তু অহনা প্রভাসের প্রতি নিজের অনুভূতিকে প্রকাশ করেছে ন কল্যাণের কাছে। হরিশংকর জলদাস 'আজকের দ্রৌপদী' গল্পে পুরাণের দ্রৌপদী ও বর্তমান যুগের দ্রৌপদী 'মহাভারত'-এ মহাপ্রস্থানিক পর্বে দ্রৌপদীর এমন কোন অনুভূতি প্রকাশ পায়নি। কিন্তু জলদাস তাঁর মহাভারত ভাবনায় দ্রৌপদীর মধ্যে কর্ণের প্রতি ভালোবাসার তীব্র অনুভূতি বিচরণ করিয়েছেন যা যুধিষ্ঠিরের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। ঠিক তেমনই অহনার প্রভাসের প্রতি এক সূক্ষ্ম

দুর্বলতা কল্যাণ বুঝতে পারে ন অহনার কথার মাধ্যমে দ্রৌপদীর এই মনোভাবনা নিয়েই জলদাস অহনা চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন। জলদাস এই গল্পে পুরাণের দ্রৌপদী চরিত্রটির ভাঙা-গড়ার খেলায় মেতে উঠেছেন।

৪

বহুকাল ধরে বহুজনের প্রযোজনা , দর্শন ও শাস্ত্রবিশ্বাসী প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগণের মতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল খ্রীস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের কাছাকাছি, এবং তার কিছুকাল পরে 'মহাভারত' রচিত হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে আদিগ্রন্থের রচনাকাল খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতা ব্দীর মধ্যে, খ্রীস্টজন্মের পরেও তাতে অনেক অংশ যোজিত হয়েছে। আধুনিক যুগের মানুষ একদিকে যন্ত্রতাড়িত , অন্যদিকে সন্ধানী, কিন্তু বিচ্ছিন্ন, কেননা বাস্তব অত্যন্ত দুঃসহ। এই জটিলতাই একালের কথোকোবি দ অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে সেকাল থেকে বহু দূরবর্তী হয়ে 'মহাভারত'এর দ্রৌপদী চরিত্রকে বিচার করেন । কথাকার বা শিল্পী নিজ জীবন -ভাবনা দ্বারা গল্প বা শিল্পকে গড়ে তোলেন। কখনো লোক -পরম্পরায় প্রবাহিত কথাকে রূপ দেন আর এসব কিছুর মধ্যে দিয়ে তিনি প্রতিকূল বর্তমানকে অতিক্রম করতে প্রয়াসী হন। যদিও যে কোনো সময়ই বৃহত্তর অর্থে নিরবচ্ছিন্ন মহাকালের অন্তর্গত, তবুও তাকে অতীত -বর্তমান-ভবিষ্যতে ত্রিধাবিভক্ত করা হয়। এই আপেক্ষিকতা এবং প্রথাবদ্ধতা থেকে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম এমন কিছু সৃষ্টি , যাকে একালের পরিসীমানায় নতুন করে দেখা যায় তাকে সমর্থন করা যায়, বিরোধিতা করা যায় , ভেঙে ফেলা যায় , নির্মাণ করা যায়। কালগত এবং ভাবগতভাবে সুদূর ও বিচ্ছিন্ন প্রবাল দূরত্বে নির্মিত অথচ গভীরতরভাবে সংলগ্ন । সেইসব সৃষ্টির অভিঘাত মুহূর্ত গুলিকে এই বর্তমানের সঙ্কটক্ষণ থেকে স্পর্শ করা যায়। মহাভারতের প্রধান নারী চরিত্র দ্রৌপদীকে নিয়েও নির্বাচিত তিনটি গল্পের গল্পকাররা তাঁদের গল্প রচনা করেছেন। এই গল্পগুলিতে দ্রৌপদীর হৃদয়ের বেদনা , প্রতিবাদী সত্তা ও ন্যায় অন্যায় জ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানী দ্রৌপদীকেও চিত্রিত করেছেন গল্পকাররা । আবার দ্রৌপদীর মনের প্রেমভাবনাকে পুনঃনির্মাণ করে দ্রৌপদী চরিত্রের সীমানা ভেঙে তাঁকে নতুন ভাবনায় গড়ে তুলেছেন। এই দ্রৌপদী নিজের মনের প্রেম ভাবনাকে অকপটে স্বীকার করতে পিছুপা হয় না। এই দিক থেকে নির্বাচিত গল্পের গল্পকাররা দ্রৌপদী চরিত্রকে তাঁদের গল্পে সার্থকভাবে বিনির্মাণ করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. চৌধুরী প্রমথ, 'ছোটোগল্প গল্পসংগ্রহ'; বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, ১৯৪১ প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৮ পরিবর্ধিত সংস্করণ, পৃ.১৫৯
২. মিত্র গজেন্দ্রকুমার, 'কথা কল্পনা কাহিনী', 'যাজ্ঞসেনী', কলকাতা; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৬৩, পৃ. ১৫৯
৩. তদেব, পৃ.১৬০
৪. তদেব, পৃ. ১৬২
৫. বসু রাজশেখর, 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত সারানুবাদ ' (সভা পর্ব); কলকাতা, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬০, পৃ. ১৩২
৬. তদেব
৭. দেবী মহাশ্বেতা; 'মহাশ্বেতা দেবীর ছোট গল্প সঙ্কলন', 'দ্রৌপদী', নয়াদিল্লি ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৩, পৃ.৩৯
৮.তদেব